আজকের কাগজ

তারিখ 07 NOV 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও নারী মুক্তি

ফারাহ দীবা চৌধুরী

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নারী মুক্তির জন্যে প্রয়োজন। অনেক গৃহিনী আমাকে বলেছেন, ''আপনারা খুব ভালো আছেন। পুরুষের মত চাকরি করছেন। ইচ্ছামতো টাকা খরচ করছেন, ইচ্ছামতো ঘুরছেন। আর আমরা সংসার ছাড়া কিছু করছি না।'' কিন্তু শিক্ষিত ও স্বনির্ভর নারী কি সত্যিই স্বাধীন? আর সেই নারী যদি অবিবাহিত হয়, তাহলে? এখানে কিছু শিক্ষিত স্বনির্ভর ও অবিবাহিত নারীর কেসস্টাডি উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হলো ঃ

কেসস্টাডি (১)

বাসস্থান সমস্যা ঃ নায়লার বয়স ২৭। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এমএসএস পাস করে বর্তমানে ঢাকায় একটি এনজিওতে উচ্চপদে আছে। ঢাকায় তার কোন আত্মীয়স্বজন নেই। প্রথমদিকে নায়লা তার অফিসের দুজন মহিলা সহকর্মীর সাথে একটি ফ্লাটে থাকত, তাদের নাম হচ্ছে রীনা ও আইভী। তারা দুজনেই নায়লার মতো অবিবাহিত। তাদের পাশের ফ্লাটেই থাকতেন রহমতুল্লাহ্ আহ্মেদ তার পরিবার নিয়ে। রহমতুল্লাহ্ আহ্মেদও তাদেরই অফিসের উর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা। তার স্ত্রী সোমা আহ্মেদ সবসময় নায়লাদের খোঁজখবর নিতেন। এতে তাদের অনেক সুবিধাও হয়েছিল। কিন্তু তারপরও নায়লা ভাবে এই সুবিধার পাশাপাশিতো অনেক অসুবিধাও হচ্ছে। যেমন সোমা আহ্মেদ সব সময়ই অফিস সময়ের পর নায়লার একটু দেরী হলেই জানতে চান কোথায় সে গিয়েছিল? নায়লা ভাবে, এ সমাজে পুরুষ হয়ে জন্মালেতো এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হত না। এ সমাজে মেয়েরা বাইরে গেলেই ভাবা হয় মেয়েটি চরিত্রহীন হয়ে গেল। কিন্তু ছেলের ক্ষেত্রে তা ভাবা হয় না। অথচ চরিত্রবান হওয়া নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে প্রয়োজন। একসময় দেখা গেল রীনা ও আইভীর বিয়ে হয়ে গেল। নায়লার পক্ষে এত বড় বাসায় একা এত ভাড়া দিয়ে থাকা সম্ভব নয়। সে ভাবল এক কামরার একটা বাসা খুঁজতে বের হবে। বাসা খুঁজতে গিয়ে দেখা গেলো অনেকেই একা একটা মেয়েকে ভাড়া দিতে রাজী নন। শেষে একজন রাজী হলেন। নায়লা সেই বাসায় উঠে এলো। প্রথমদিকে বাড়িওয়ালীকে খুব ভালো মনে হয়েছিল। তিনি একজন বুয়া ঠিক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরই বোঝা গেল বাড়িওয়ালী বুয়ার মাধ্যমে সবসময় খোঁজখবর নিতেন নায়লা কখন বাসায় ফিরে কে কে তার বাসায় আসে ইত্যাদি। নায়লা নিজে চরিত্রহীন নয় বলে তার আরো খারাপ লাগল। ভাবল শুধুমাত্র অবিবাহিত নারী হবার কারণে সমাজ কেন তাকে সবসময় সন্দেহের চোখে দেখবে? একদিন বুয়া ১৫ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে গেল। নায়লা বাসায় একা। একা থাকায় আরো সতর্ক হয়েছে। খুব পরিচিত না হলে দরজা খোলেনি। কিন্তু রাতে সমস্যা দেখা দিল। হঠাৎ রাতে ঘুম ভাঙতেই তার মনে হতো এখন যদি চোর আসে। চোর আসলে পুরুষ চোরই আসবে। যেহেতু নায়লা নারী ও শারীরিকভাবে দুর্বল, চোরতো সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু নায়লা পুরুষ হলে তো এটা ভাবতে হত না। একসময় সে ভাবল কোন পরিবারের সাথে থাকলে কেমন হয়? পরিবারের কথা ভাবতে গিয়ে ভাবল এমন একজনের সাথে থাকা উচিত যিনি একটু বয়স্ক হবেন ও যার ছেলেমেয়ে একটু বড় হবে যাতে কেউ কিছু বলতে না পারে। আসাদ আহ্মেদ নায়লার মামার বন্ধু। আরেকটি এনজিওতে কাজ করেন। বয়স ৫০। তার দুই মেয়ে। বড় মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়ে। তিনি নিজেই নায়লাকে বললেন যে, তিনি বাসা খুঁজছেন। সুতরাং নায়লা ইচ্ছা করলে তাদের সাথে থাকতে পারে। এতে আসাদ আহ্মেদ বড় বাসায় থাকার সুবিধা পাবেন। নায়লা রাজী হলো। কিন্তু বাসা ঠিক করার পর দেখা গেল আসাদ আহ্মেদ কিছু শর্ত দিলেন। যেমন মাসে ২/৩ দিন হাদিস শুনতে হবে, কোন পুরুষ সহকর্মীকে বাসায় আনা যানা না, ইত্যাদি। নায়লা দ্বিতীয় শর্তটি মেনে নিলেও প্রথম শর্তটি মানেনি। সে বলেছে সে নিজেই ধর্মচর্চা করে। যেমন- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, মানুষের প্রতি এবং পরিবারের সদস্যদের প্রতি দায়িত্বগুলো যথাসাধ্য পালন করতে চেষ্টা করে। আর যেহেতু সে শিক্ষিত তাকে হাদিস শোনাতে হবে না। ইচ্ছা হলে নায়লা নিজেই হাদিস পড়ে নিতে পারবে। হাদিস জানানো উচিত অশিক্ষিত, নিরক্ষরদের যারা পড়তে জানে না। তবুও দেখা গেল আসাদ আহ্মেদ রাজী হলেন। হয়তো অর্থনৈতিক সুবিধার কথা ভেবে নায়লা আসাদ আহ্মেদের পরিবারের সাথে থাকতে লাগল। দেখা গেলো এখানেও কোন প্রাইভেসী নেই। বাসায় ফিরেই ভদ্রমহিলাকে বলতে হত কোথায় গিয়েছিল কার সাথে কি কথা বলল ইত্যাদি। নায়লা ভাবত বাইরে থেকে কিছু শোনার আগে নিজে থেকেই বলা ভাল। তারপরও কষ্ট হত নায়লা নারী বলেই বলতে হচ্ছে। অফিসের পর মাঝে মাঝে নায়লা তার কিছু সহকর্মীর বাসায় যেত। সেই বাসাগুলো নায়লার বাসা থেকে খুব একটা দূরে নয়। সে ভাবত একটু দেরী হলেই বা কি? কিন্তু দেখা গেলো আসাদ আহ্মেদ এতে মনক্ষুণ্ন। নায়লার কথা হলো সে কোথায় গেল, কি করল ইত্যাদি বিষয়ে একমাত্র তার পরিবারের সদস্যরা প্রশ্ন করতে পারে, অন্য কেউ নয়। শুধুমাত্র অসামাজিক কাজ করলেই সে সমাজের কাছে জবাবদিহি করবে, নায়লাতো কোন অসামাজিক কাজ করছে না? তবুও কেন তাকে এত কথা শুনতে হয়?

নায়লার কেস থেকে বলা যায় ঃ

(১) শারীরিক দুর্বলতার জন্যে অবিবাহিত নারীর একা থাকা সম্ভব হয় না। কারণ রাষ্ট্র নারীর নিরাপত্তা দিতে পারছে না।

(২) সমাজ অবিবাহিত নারীর একা থাকাকে সন্দেহের চোখে দেখে যা পুরুষের ক্ষেত্রে ঘটে না।

(৩) অবিবাহিত নারীর অভিভাবকের ভূমিকায় সবাই অবতীর্ণ হতে চায়। ভাবে অভিভাবকহীন নারীর চরিত্র খারাপ হয়ে যেতে পারে, যা পুরুষের ক্ষেত্রে ভাবা হয় না। অথচ সৎ চরিত্রবান হওয়া নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে প্রয়োজন।

কেসস্টাডি (২) বিয়ে ঃ

কলি বা[illegible]র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক। তারা ৫ বোন, কলির বাবা মারা গেছেন ১৯৮৭ সালে। এমএসএস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করার পর সে প্রথমে একটি প্রতিষ্ঠিত এনজিওতে গবেষক পদে যোগ দিল। ইন্টারভিউর সময় প্রশ্ন করা হলো বিয়ে করছেন না কেন? কিন্তু কোন পুরুষ আবেদনকারীকে এই প্রশ্ন করা হয়নি। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েও একই রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হল। তাকে বলা হলো, ''বিয়ে কবে করবেন?'' কলি সরাসরি উত্তর দিল, ''আল্লাহ্র যখন হুকুম হবে, তখন।'' বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর একদিন কলি একটি কাজে তার দুইজন সহকর্মীর সাথে কুমিল্লায় যাচ্ছিল। কলি আগেই জানত তার দুইজন সহকর্মীই নিজেদেরকে ভালো মুসলমান হিসেবে দাবি করেন। সারাদিনের ভ্রমণে অনেক কথা হল। এক সময় কলির পারিবারিক প্রসঙ্গ আসল। তার দুইজন সহকর্মী বললেন, ''আপনার বাবা নেই, ভাই নেই। একজন অভিভাবকের প্রয়োজন, বিয়ে করে ফেলেন, অভিভাবক পাবেন।'' কলির উত্তর ছিল, ''আপনারা ভাল মুসলমান, তাই ভালো করেই জানেন নারী-পুরুষ উভয়ের অর্থাৎ মানুষের অভিভাবক আল্লাহ্ আমি যেহেতু মানুষ, কখনো মনে হতে পারে আমার একজন বন্ধুর প্রয়োজন, তবে অভিভাবক নয়। অভিভাবক হলেন আল্লাহ্।'' এরপর কলির সহকর্মীরা আর কিছু বলেননি।

কলির এই কেস থেকে বলা যায় ঃ (১) এনজিওগুলো নারী মুক্তির কথা বললেও, নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার কথা বললেও তাদের কর্মকর্তাদের মধ্যেই রয়েছে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সে জন্যেই পুরুষ আবেদনকারীকে বিয়ে সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হয় না, অথচ নারীদেরকে করা হয়।

(২) দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হবার

আজকের কাগজ

তারিখ 07 NOV 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

পরও নারীরা নারী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, মানুষ হিসেবে নয়।

(৩) বিয়েকে নারীদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে ভাবা হয়। অথচ বিয়ে শুধুমাত্র নারী নয়, নারী-পুরুষ উভয়ের অর্থাৎ মানুষের জীবনে একটা অংশ হলেও সবটাই নয়।

কেসস্টাডি (৩) বিয়ে ঃ

বীথি বর্তমানে ম্যাজিস্ট্রেট। বীথির বাবা নেই। ছোট ভাইর পড়াশোনার খরচ তাকেই চালাতে হয়। তার ছোট ভাই দু' বছর পর এমএ পাশ করবে। বীথির ইচ্ছা এ দুবছর পর বিয়ে করার। ম্যাজিস্ট্রেট পদে চাকরি পাবার পর বীথি দেখা করতে গেল তার এক শিক্ষকের সাথে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অনেক আলাপের পর বীথিকে তার সেই শিক্ষক বললেন, ''তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল। নইলে লাবনী চৌধুরীর মত অবস্থা হবে। লাবনীর তো শেষ পর্যন্ত বিয়েই হলো না।'' বীথির অধ্যাপক আরো বললেন, ''লাবনী পিএইচডি করে ফিরেছে, আমিও। আমাকে একজন বলল লাবনীকে বিয়ে করতে আমি রাজি হইনি।'' অথচ লাবনী চৌধুরী বীথির সেই অধ্যাপকের চাইতেও মেধাবী।

বীথির এই কেস থেকে বলা যায় ঃ

(১) কোন নারী অবিবাহিত থাকলে ভাবা হয় তার বিয়ে হয়নি। একজন নারী যে ব্যক্তিগত কারণে বিয়ে করেননি বা করছেন না তা ভাবা হয় না।

(২) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সচেতনতা আনতে পারে না, নইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেন ভাবতে পারেন না নারী ও পুরুষের মতই তার ব্যক্তিগত কারণে বিয়ে না করতে পারে।

কেসস্টাডি (৪) প্রথম শ্রেণীর চাকরিজীবী পাত্রীর অন্যান্য যোগ্যতা ঃ

বিভা প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা। তার কর্মস্থল চট্টগ্রামে। একদিন বিভা তার সহকর্মী রূপার বাসায় বেড়াতে গেল। কথায় কথায় রান্নার প্রসঙ্গ উঠেছে। বিভা বলেছিল, ''নারী-পুরুষ সবার জন্যে রান্না জানা দরকার। আমার প্রয়োজন পড়েনি বলে অবশ্য কখনো রান্না করা হয়নি।'' রূপা আঁতকে উঠেছিল, বলেছিল, ''তুমি কখনো ছেলেদের [illegible] বলবে না যে কোনদিন রান্না করনি, ছেলেরা তোমাকে ভয় পাবে।'' আর একদিন অফিসিয়াল একটি বিষয়ে বিভার সাথে তার সহকর্মী তাপসের খুব তর্ক হচ্ছিল। বিভার মনে হচ্ছিল তাপস একটি ভুল সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে। পরে অবশ্য তাপস তার ভুল বুঝতে পেরেছিল। বিভা এবং তাপসের মধ্যে তর্কাতর্কির সময় তন্নী উপস্থিত ছিল। তন্নীও বিভার সহকর্মী। তন্নী পরে বলেছিল, ''বিয়ের আগে কারো সাথে এত তর্ক করতে হয় না, তর্ক করলে মেয়েদের বিয়ে হয় না।'' এই বলেই তন্নী থেমে থাকেনি। অনেকদিনই আলাপের মাঝে তন্নী বলত, ''বিয়ের আগে সন্ধ্যার ভিতর বাড়ি ফিরতে হয়। তাছাড়া পুরুষ সহকর্মীদের সাথেও বেশি কথা বলা উচিত নয়, এতে তুমি সস্তা হয়ে যাবে।''

এই কেস থেকে বলা যায়, প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা হবার পরও আমাদের সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে নারীর কাছ থেকে আরো কিছু যোগ্যতা আশা করা হয়, অথচ পুরুষের কাছ থেকে আশা করা হয় না। যেমন ঃ

(১) রান্না জানা
(২) অন্যায় হলেও প্রতিবাদ না করা
(৩) সন্ধ্যার ভিতর বাড়ি ফেরা
(৪) পুরুষদের সাথে বেশি কথা না বলা

অথচ বর্তমানে অনেক স্বামী-স্ত্রী উভয়কে বাইরে কাজ করতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ দায়িত্বে পারিবারিক কাজ ও সন্তান প্রতিপালন করা উচিত। তাই শুধু নারীদের নয়, নারী-পুরুষ উভয়ের রান্না জানা উচিত। আজকাল পাত্রী হিসেবে স্বাবলম্বী নারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হলেও সেই শিক্ষিত, সচেতন, স্বাবলম্বী নারীর কাছে আবার অন্যায়ের প্রতিবাদ আশা করা হয় না। অর্থাৎ এই সমাজ শুধুমাত্র অর্থের কারণে স্বাবলম্বী নারীকে অগ্রাধিকার দেয়। সেই স্বাবলম্বী নারী যে একজন মানুষ সেটা স্বীকার করতে চায় না। সে জন্যেই অসামাজিক বা নৈতিকতা বিরোধী কোন কাজ না করার পরও আশা করা হয় সন্ধ্যার ভিতর যেন মেয়েটি বাড়ি ফিরে বা পুরুষদের সাথে যেন বেশি কথা না বলে।

কেসস্টাডি (৫) সমান অধিকার ঃ

লাভলী অবিবাহিত। বয়স ২৮। এমএ পাশ করে বর্তমানে ঢাকায় একটি প্রাইভেট ফার্মে কাজ করছে। তাদের অফিস থেকে যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। অথচ লাভলীকে প্রতিদিন মিরপুর থেকে মতিঝিলে তার অফিসে আসতে হচ্ছে। একসময় অফিসে খুব কাজের চাপ ছিল। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যা হয়ে যেত। সন্ধ্যার পর মতিঝিল থেকে মিরপুরে যেতে লাভলীর খুব ভয় লাগত। লাভলীর মা খুব চিন্তা করতেন। একদিন লাভলী তার ডিরেক্টরকে অনুরোধ করল তাকে যেন সন্ধ্যার আগে বাড়িতে যেতে দেয়া হয়। তার সহকর্মী তুষার সাথে সাথে আপত্তি জানালেন। তুষার বললেন, 'সমান অধিকারের যুগে নারী-পুরুষ একই সাথে কাজ করছে। সেখানে নারী হিসেবে লাভলী কেন আগে বাড়িতে যাবে?'' উত্তরে লাভলী বলেছিল, ''অফিস থেকে যাতায়াতের ব্যবস্থা করলে এই অনুরোধ করতাম না।''

লাভলীর এই কেস থেকে বলা যায়, পুরুষরা সমান অধিকারের ভুল ব্যাখ্যা করে। নারী শারীরিকভাবে পুরুষের তুলনায় দুর্বল। সমান অধিকারের অর্থ এই দুর্বলতার জন্যে নারী যেন কোনভাবেই বৈষম্যের শিকার না হয়। কারণ পুরুষের মত নারীও একজন মানুষ। নারীর সমঅধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘের ৩০টি ধারা সম্বলিত দলিলের চতুর্থ ধারায় বলা হচ্ছে, ''নারীর মাতৃত্ব, নারীত্ব ও সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক অবস্থানের বিবেচনায় বিশেষ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার প্রয়োজন হলে সে ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে এবং এ ধরনের বিশেষ ব্যবস্থাদি গ্রহণকে সমঅধিকারের পরিপন্থী মনে করা চলবে না বা পুরুষের সাথে বিভেদমূলক আচরণ বলে বিবেচনা করা চলবে না।'' বাংলাদেশ সরকারও জাতিসংঘের এই ধারাটি অনুমোদন করেছে। অথচ সমান অধিকারের নামে এখন বাসেও অসুস্থ বা গর্ভবতী নারীকে বসতে দেয়া হয় না।

কেসস্টাডি (৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ রাজনীতি ঃ

মুনা বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক। অবিবাহিত। বয়স ২৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগদান করার পর সে তার সহকর্মী রীতার কাছে জানতে চাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাবে কয়টা পত্রিকা রাখা হয়। উত্তরে রীতা বলেছিল, ''ক্লাবে পত্রিকা পড়তে যাওয়া উচিত নয়। বিয়ে হয়নি তো, লোকে খারাপ বলবে'' তারপর মুনার আর ক্লাবে পত্রিকা পড়তে যাওয়া হয়নি। একসময় মুনা ভাবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ রাজনীতিতে জড়িত হবে। তাই মাঝে মাঝে ক্লাবে যেত, পত্রিকা পড়ত, অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে আলাপ করত। অন্যান্য নারী শিক্ষকরাও রাজনীতিতে আগ্রহী নয় বলে ৪/৫ মাস পর মুনা রাজনীতি থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল।

মুনার এই কেস থেকে বলা যায় ঃ (১) বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাবের চাঁদা নারী শিক্ষকরা দিলেও ক্লাবে যাবার বিষয়ে আপত্তি উঠে। সেই নারী যদি অবিবাহিত হন, তবে তাঁর যাওয়াটাকে আরো বিপজ্জনক মনে করা হয়। ক্লাবে বিভিন্ন পত্রিকা পড়া, টিভি দেখা বা বিভিন্ন শিক্ষকের সাথে মতের আদান-প্রদান থেকে নারী শিক্ষকদের বঞ্চিত করা হয়।

(২) এর ফলে সক্রিয়ভাবে নারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। কারণ এতে জড়িত হতে হলে সকল শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় এবং ক্লাব হচ্ছে এই যোগাযোগের একটা বড় মাধ্যম।

(৩) কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষক যদি অবিবাহিত থাকেন, তবে ধরে নেয়া হয় যে তার বিয়ে হয়নি। তিনি যে ব্যক্তিগত কোন কারণে বিয়ে করেননি তা ভাবা হয় না। তাই অবিবাহিত কোন পুরুষ সহকর্মীর সাথে আলাপ করলেই বিভিন্ন মন্তব্য করা হয়।

(৪) জাতীয় রাজনীতির মত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রুপ রাজনীতিকেও ভাবা হয় পুরুষের ক্ষেত্র হিসেবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরুষ শিক্ষকরা চান না যে নারীরা মিটিংগুলোতে অংশগ্রহণ করুক।

(৫) গ্রুপ রাজনীতিতে নারী শিক্ষকদের অনাগ্রহও নারীর প্রতি পুরুষদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির একটা বড় কারণ। ২/১ জন নারীর অংশগ্রহণ পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার জন্যে যথেষ্ট নয়। একা ২/১ জনের পক্ষে বেশি দিন রাজনীতিতে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

সবশেষে বলা যায় সমাজ আগের তুলনায় অনেক দূর এগিয়ে গেলেও রক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধের কারণে নারীরা প্রকৃত স্বাধীনতা পাচ্ছে না। নারী মুক্তির জন্যে তাই নারীকে শুধু শিক্ষিত ও অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তুললেই চলবে না, মূল্যবোধেরও পরিবর্তন করতে হবে। এর জন্যে নারী-পুরুষ উভয়কে সচেতন করতে হবে। কারণ নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতা অর্জিত হতে পারে পরস্পরবিরোধী সংগ্রামের মাধ্যমে নয়, বরং উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসের ভেতর দিয়ে।

ফারাহ্ দীবা চৌধুরী ঃ প্রভাষক, রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।